Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে ভারতীয় দর্শন চিন্তার প্রভাব : ঋত ও ধর্ম

শুক্লা নাথ

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/27_Sukla-Nath.pdf

সারসংক্ষেপ: অনুমান করা যায় শিল্প বিপ্লবের সময় থেকেই Anthropocene যুগের সূচনা। বিবেকবান পুরুষ-স্বরূপ মানুষ নিজের বুদ্ধির বড়াই করলেও তারা নিজেদের অজান্তে এই যুগের সূচক। অপরিসীম ভোগ ও লালসাই প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টির কারণ। প্রতিফলন লক্ষ করা যায় বিশ্ব উষ্ণায়ন, আবহাওয়ার পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ জলস্তরের অবনমন, জীব প্রজাতির অবলুপ্তির মধ্যে। কেবলমাত্র পৃথিবীতেই ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে জটিল প্রাণের অস্তিত্ব লক্ষণীয়। প্রাণীজগতের ন্যায় জড়জগতেও বৈচিত্র লক্ষণীয়। অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে এক শৃঙ্খলে গ্রথিত করেছে প্রকৃতির একরূপতা নীতি। এই নীতিই জগতের পরিচালন শক্তি। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রন করতে, বহুকাল আগে থেকেই প্রাচীন বেদে 'ঋত' নিয়মের উল্লেখ রয়েছে। 'ঋত' জগতের অলঙ্ঘনীয় নীতি। এক বিমূর্ত অপরিনামী প্রাকৃত শক্তি। 'ঋত' কর্মবাদের নামান্তর। কারণ 'ঋত' কর্মানুসারে ফল প্রদাতা। 'কর্ম' শব্দটি ধর্মের সঙ্গে সমার্থক। ধর্ম নিয়মই কর্ম নিয়ম। বৈদিক যুগে ঋতের ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে ধর্ম অনুসারে কর্ম করার নির্দেশ দেওয়া আছে। এই প্রবন্ধ বৈদিক বিশ্বাসের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পরিবেশ মূলক আলোচনার প্রয়াস মাত্র। প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রভাবরেখা তৎকালীন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট।

সূচক শব্দ: Anthropocene, ঋত, ধর্ম, আত্মস্পৃহা, কর্ম, বিশ্বনীতি, অপূর্ব, বিশ্ব উষ্ণায়ন

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ সময়কাল থেকে পরিবেশে সদর্থক চিন্তার সূচনা হয়। দার্শনিক প্রেক্ষাপটে, মনুষ্য আচরণগত প্রভাব সংক্রান্ত নৈতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু। পরিবেশ নৈতিক আলোচনার পূর্ববর্তী সময় প্রচলিত ধারণা অনুসারে, মানব প্রজাতিই পৃথিবী গ্রহের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল। ফলত আত্মাভিমানী মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অন্যান্য জৈব প্রজাতিকে তাদের অধীনস্ত জ্ঞানে আচরণ করে। বর্তমান সময়েও এই অ-বিবেকী মানসিকতা জগতের বিবেকবান পুরুষে অক্ষুন্ন রয়েছে, যখন পরিবেশবিদগণ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিষয়ে আশঙ্কিত। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ ও আত্মস্পৃহাই এই প্রজাতিকে বসুন্ধরার উচ্চতর জীব থেকে নিম্নতর স্তরে পর্যবসিত করেছে। প্রযুক্তি বিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক নিত্য নতুন আবিষ্কারের অহমিকায় সে তার বিবেচনা বোধ হারিয়েছে। পৃথিবীর এমন কোনো স্থানের উল্লেখ করা কঠিন যেখানে মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। যার বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বিশ্বের প্রতিটি অংশে। সর্বক্ষেত্রে মানুষের এই অবাধ বিচরণ আমন্ত্রণ জানিয়েছ নতুন Anthropocene বা মনুষ্যযুগের।

সমসাময়িক সময়ে, আন্তর্জাতিক পরিসরে চর্চিত বিষয় Antropocene যুগ। বিশেষজ্ঞ মতে, এই যুগের সূচনা আশঙ্কার বিষয়। মনুষ্যযুগ, সৃষ্টির তুলনায় আমাদের বিনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। Holocene যুগে দীর্ঘ ১২ বছর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল স্থিতিশীল অবস্থায় বিরাজমান ছিল। দীর্ঘদিন ব্যাপী অপরিমেয় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, বৃক্ষনিধন, কৃষিজমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্তে রাসায়নিক সারের ব্যবহার, পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় পদার্থ, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা, কৃষিকাজ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন, নগরায়ণ ও শিল্পায়নের সহায়ক। বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধি-এর অন্যতম কারণ। তাই বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বনের ন্যায় গ্রিন হাউস

গ্যাসের পরিমাণে বাড়ছে, যা মনুষ্যযুগকে তরান্বিত করে। আনুমানিক শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই Anthropocene এর প্রারম্ভ। ডাচ রসায়নবিদ পল ক্রুটজেন ২০০০ সালে প্রথম এই যুগের নামকরণ করেন। যদিও এই যুগের সঠিক নির্ধারিত সময় বিবেচ্য বিষয়। তবে এ যুগের প্রতিফলন স্বরূপ পেয়েছি — বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ুর প্রভূত পরিবর্তন, ভুগর্ভস্থ জলস্তরের অবনমন, বহু জীব প্রজাতির বিলুপ্তি, সমুদ্রের জলস্তর বৃদ্ধির ন্যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

মানুষের সুখ-সুবিধার্থে সমগ্র জড়জগৎ ও জীবজগৎ আত্ম নিয়োজিত — মানবকেন্দ্রিকতাবাদী এই ধারণা অলীক ও সর্বৈব মিথ্যা, এই বিষয়ে কোনো অবকাশ নেই। আমাদের বসুন্ধরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রাণময়তা, অন্যান্য গ্রহদের থেকে ভিন্ন। এক কোষ বিশিষ্ট অ্যামিবা যেমন পৃথিবীতে অস্তিত্বশীল, তেমনি অসংখ্য কোষ সমন্বিত জটিল প্রাণীও বিচরণশীল। প্রাকৃতিক জগতেও এর অন্যথা ঘটেনি। বৈশেষিক পরমাণুবাদ অনুসারে জগতের উপাদান কারণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, পরমাণু। চতুর্ভূতের পরমাণু সংযোগে বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি। তবে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ একটি মাত্র শৃঙ্খলায় বাঁধা। অফুরন্ত বিভিন্নতার মাঝে এক নিয়ম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। দর্শনের পরিভাষায় এই নিয়মকে প্রকৃতির একরূপতা নীতি বলা হয়। এই নীতি দ্বারা পৃথিবী পরিচালিত। তাই এই নিয়মের ঘেরাটোপে মানুষের হস্তক্ষেপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আহ্বান করে। মনুষ্য সম্প্রদায়ের প্রাকৃতিক কিংবা প্রাণীমহলে অনধিকার প্রবেশ প্রতিহত করতে বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বনের পাশাপাশি, পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয়। প্রকৃতির আমোঘ নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা এক্ষেত্রে আবশ্যক। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক চিন্তায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বৈদিক নানান সাহিত্যে এই বিষয়ে গভীর আলোচনা রয়েছে। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ 'বেদ'। 'বেদে'র প্রথম খণ্ড 'সংহিতা'। 'ঋক্‌বেদ' 'সংহিতার' অন্তর্গত। সেখানে ওই চিরস্থায়ী অপরিবর্তনীয় নীতি, যা জগতের অখণ্ডতা রক্ষা করে, 'ঋত' নামে অভিহিত হয়েছে।

বেদের নানান ভাগে 'ঋত' প্রত্যয়ের উল্লেখ রয়েছে। 'ঋত' প্রসঙ্গে বেদে বলা হয়েছে, এটি এক মহাজাগতিক শক্তি যার দ্বারা প্রকৃতি ও জগতের স্থায়িত্ব নির্ধারিত হয়। বিশ্বচরাচর ঋত নিয়মাধীন। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও এক চিরন্তন শাশ্বত অপরিনামী নিয়ম। উপাদান সমন্বিত হয়ে জগৎ রচনা, তার লয় এবং উপাদান বিযুক্ত হয়ে জগৎ এর ধ্বংস, 'ঋত' দ্বারা সংঘটিত। যে নিয়ম অমান্য করার স্বাধীনতা আমাদের নেই। নানান পার্থিব বৈচিত্র্যকে এই বিমূর্ত শক্তি একসূত্রে গ্রথিত করেছে। জগতে এমন আর কোনো শক্তি নেই যা এই নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে। বেদে প্রচলিত, ঈশ্বরও 'ঋত' নিয়ম মান্য করেন। যেহেতু 'ঋত' অচেতন সত্ত্বা তাই তাকে প্রয়োগের নিমিত্তে সচেতন কর্তা রূপে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। এমন দাবিও করা হয় যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই 'ঋত' নিয়ম বর্তমান ছিল।

কার্যকারণ নীতি 'ঋত' ধারণার প্রতিপাদিত রূপ। জগতের প্রতিটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পূর্ববর্তী কারণ থেকে উদ্ভূত। বিজ্ঞানসিদ্ধ কার্যকারণ নিয়ম সর্বজন স্বীকৃত। এটি একটি সার্বিক নিয়ম। কারণিক নিয়মানুসারে, কারণ কার্যের পূর্ববর্তী। প্রতিটি কারণের মধ্যে কার্য প্রছন্ন অবস্থায় থাকে। কার্য, কারণের অন্তর্নিহিত প্রকটিত রূপ। নির্দিষ্ট কারণ থেকে নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হয়। অতএব, ঐক্য নীতি এক্ষেত্রেও প্রমানিত হয়। 'বেদে' দাবি করা হয়, যা কিছু জগত রূপে প্রতীয়মান, 'ঋত' তার পূর্ববর্তী। ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণবাদ প্রসঙ্গে মতানৈক্য থাকলেও, কার্য উৎপত্তির পশ্চাতে কারণ অবশ্যম্ভাবী রূপে বিদ্যমান, এ বিষয়ে প্রায় সকল সম্প্রদায় একমত। সাংখ্য মতে,

"অসদকরণাৎ উপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্।"[১]

(শর্ম্মা)

অর্থাৎ, কার্য সৎ। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে প্রছন্ন অবস্থায়ে থাকে। আবার ন্যায় মতে, কার্য অসৎ। কার্য

কারণ অভিন্ন নয়। কার্য এক নতুন আরম্ভ। কারণের অভাব থেকে কার্যের উৎপত্তি, বৌদ্ধ মতে স্বীকৃত। সিদ্ধান্ত করা যায়, কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত যৌক্তিক মতবাদ। জগতের বিভিন্নতায় কার্যকারণ সম্বন্ধকে নিয়মিত করেছে 'ঋত' শক্তি। 'ঋত' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'বিষয়ের গতিময়তা'। চন্দ্র, সূর্য, নদী, অগ্নি, পৃথিবী প্রভৃতির নিয়মানুবর্তিতা নির্ধারিত হয় 'ঋত' দ্বারা। মানুষের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ দ্বারা এদের গতিবিধি পরিবর্তনের প্রয়াস কখনো কাম্য নয়।

জড় জগতের ন্যায়, নৈতিক জগতেও 'ঋত' এর প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত। নৈতিক অনৈতিক বিচার কেবল ইচ্ছাকৃত কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ একমাত্র জীব যে নিজ বুদ্ধি ব্যবহার করে ইচ্ছানুসারে কর্ম করতে পারে এবং কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে। দুটি বিকল্পই তাদের কাছে উন্মুক্ত। কিন্তু যে ক্রিয়া ইচ্ছাধীন নয়, তা কখনো নীতিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় নয়। ইচ্ছার স্বাধীনতা মনুষ্য জাতির অন্যতম প্রাপ্ত গুণ, যা তাকে অন্যান্য জীব থেকে ভিন্ন করে। জৈব প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের আছে। আর ঠিক সেই কারণে মানুষের কর্মের নৈতিক বিচার সম্ভব, পশুদের নয়। পরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে যে বিশ্বনীতি দ্বারা মানুষ শৃঙ্খালাবদ্ধ তা 'ধর্ম' নামে পরিচিত। প্রকৃতির ঘটনা সমূহ যেভাবে 'ঋত' নিয়মাধীন, অনুরূপে মনুষ্য জগতের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম, 'ধর্ম' নামক নৈতিক নিয়ম দ্বারা চালিত। 'ধর্ম' প্রত্যয়টি বর্তমান আলোচনায় কোনো বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নির্দেশ করছেনা। সামাজিক ও নৈতিক বিধি রূপে স্বীকার করা হয়েছে। যে সার্বিক নৈতিক বিধি মানুষের কর্ম নিয়ম পরিচালনা করে।

'ধর্ম' প্রত্যয়টির সঙ্গে কর্ত্যবের ধারণা যুক্ত। সমাজে বসবাসরত জীব হিসেবে আমাদের কর্তব্য সমাজকে অবিচল রাখা। সামাজিক বিধি নিষেধ সঠিক অর্থে পালন করা। সামাজিক জীবদের সুরক্ষা প্রদান করা। প্রাকৃতিক শক্তি ও সম্পদের প্রাচুর্য, পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রেখেছ। তাই বিবেক সম্পন্ন প্রাণী হয়ে তাদের তত্ত্বাবধান করা আমাদের দায়িত্ব। জীব ও জড় প্রত্যেকের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ, যাকে 'বেদে' সাধারণ ধর্ম বলা হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে দু'প্রকার ধর্ম প্রচলিত ছিল। সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম। অভ্যাস বৃত্তির অনুশীলন পশু দ্বারাও অনুসৃত হয়। কেবলমাত্র মানুষ, যে স্বভাবের বিপরীতে হাঁটতে পারে। সেখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ইন্দ্রিয় কামনাকে উপেক্ষা করে বিবেক চালিত হয়ে সমাজের মঙ্গাল সাধক কর্ম কেবল মনুষ্য দ্বারা সম্পাদিত কর্ম। আত্মা স্বভাবত বিবেকী। তাই সাধারণ ধর্ম সামাজিক নিয়মের নৈতিক ভিত্তি। প্রতিটি মানুষের এই ধর্ম অনুসরণীয়। **অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য** — এই পাঁচটি সাধারণ ধর্মের উল্লেখ রয়েছে। 'মনুসংহিতায়' সাধারণধর্মের ভিন্ন বিভাগ লক্ষ করা গেলেও, সেগুলি উক্ত ধর্মের সঙ্গেই সম্পর্কিত। জৈন মতানুসারে, কায়-মন-বাক্যে অহিংস আচরণ মানুষের প্রথম ও প্রধান পালনীয় ধর্ম। এখানে 'ধর্ম' শব্দটি কর্তব্য অর্থে ব্যবহৃত। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে মানুষ মানবেতর জীব ও পার্থিব সম্পদের ক্ষয় সাধন করে। এগুলি একপ্রকারের হিংসাত্মক ক্রিয়া। **অহিংস** ধর্ম আমাদের শ্রদ্ধাবান করে তোলার প্রচেষ্টা। পরবর্তী সাধারণ ধর্ম **সত্য** যা প্রকৃতপক্ষে অহিংসতার দ্যোতক। আবার বৈদিক যুগ থেকে ধর্ম ও সত্য শব্দ দুটি সমার্থক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গান্ধিজী বলেছেন, ঈশ্বরের জগতে আমরা অছি মাত্র। আমাদের দায়িত্ব কেবল তার পরিচর্যা এবং সংরক্ষণ। পরিবর্তে আমরা যদি নিজেদের সেই সম্পদের মালিক বলে মনে করি, তা অধিকার করার চেষ্টা করি, তবে তা হয় স্তেয় বা চৌর্যবৃতির সমতুল্য। তৃতীয় সাধারণ ধর্ম আমাদের **অস্তেয়** পালনের আজ্ঞা দেয়। অর্থাৎ অন্যের দ্রব্যের প্রতি লোভ সংবরণ। জাগতিক সম্পদ সমূহের অছি জ্ঞানে ব্যবহার, প্রকৃতির প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল করে তোলে। সেই ব্যবহার হতে হবে সীমিত। **অপরিগ্রহ** ধর্ম আমাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত সম্পদ আরোহণ থেকে বিরত থাকার আদেশ দেয় এবং নিম্নতর প্রাণীদের আন্তরমূল্যের ধারণা প্রদান করে। উক্ত চারটি ধর্ম পালনের নিমিত্তে একান্ত প্রয়োজনীয় পঞ্চম ও শেষ ধর্ম, ইন্দ্রিয় সংযম বা **ব্রহ্মচর্য** ধর্ম। সাধারণ ধর্ম বা কর্ম পালনের প্রধান উদ্দেশ্য, সমাজ কল্যাণমূলক কর্মে আত্মনিবেদন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন।

বর্ণাশ্রম ধর্মকে বিশেষ ধর্ম বলা হয়। কারণ এটি শর্তসাপেক্ষ ধর্ম, যা কেবল মানুষের বর্ণ ও আশ্রম অনুসারী। বর্ণধর্ম ভারতীয় চিন্তাধারায় বৃত্তি অনুযায়ী পালনীয় কর্তব্য কর্ম। প্রাচীন যুগে কর্ম দক্ষতা প্রয়োগ করে বর্ণ নির্ধারিত হতো এবং তদনুসারী সমাজ গঠনমূলক কর্তব্য সেই ব্যাক্তিকে পালন করতে হতো। যদিও পরবর্তী কালে ওই ধর্ম বৃত্তির পরিবর্তে বংশানুক্রমিক পদমর্যাদার প্রশ্ন উত্থাপন করে। ঋক্ বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সমাজে চারটি বর্ণের প্রচলন ছিল। তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা ছিল সমাজের চালিকা শক্তি। কিন্তু মানুষ তার কর্ম দক্ষতা যখন শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে প্রয়োগ করতে শুরু করল, অপরিসীম লোভের নেশায় মত্ত হয়ে সাধারণ ধর্মকে উপেক্ষা করতে দ্বিধা করলনা, তখন থেকেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে তার প্রভাব রেখা পড়া শুরু হয়।

সাধারণ ধর্ম অনুসারী হয়ে কীভাবে সংসার জীবন অতিবাহিত করতে হয় — তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় আশ্রমধর্মে। ঋণ পরিশোধের বর্ণনা দেয় আশ্রমধর্ম। ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ, নৃ-ঋণ ও ভূ-ঋণ। উল্লেখিত প্রতিটি ঋণ মানুষের জীবনাবস্থায় পরিশোধ করা আবশ্যিক। সমাজবদ্ধ জীব মানুষ, তার পূর্বপুরুষের কাছে, পরিবারের কাছে, মনুষ্যতর জীব ও জড়ের নিকট নানাভাবে ঋণী। আমরাও তাই ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে তাদের সুরক্ষিত করতে দায়বদ্ধ। অতএব, সাধারণ কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মই অনৈতিক হতে শেখায় না। তদুপরি আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে, কর্তব্যপরায়ণ করে জনজীবনের প্রতি। ভারতীয় নৈতিক বিধির নিদর্শন আমরা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা থেকে পেয়ে থাকি।

'ধর্ম' প্রত্যয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্নক্ষেত্রে, যার মধ্যে অন্যতম পুরুষার্থ। চারটি পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম প্রথম। "ধারণাৎ ধর্মম্ ইত্যাহুঃ"— ধর্ম হলো, যা ধারণ বা রক্ষা করে। পুরুষার্থে 'ধর্ম' শব্দের অর্থ করা হয় 'আচরণ'। নীতিসম্মত আচরণই কাম্য। ধর্ম ব্যহত হলে ব্যঘাতকারীর বিনাশ করে। ধর্ম নিয়ম তাই সনাতন ও নিয়ত। বেদের মন্ত্র ভাগে উল্লখ আছে, 'ঋত' শ্বাশত নিয়ামক। ঋত ও ধর্ম সমপর্যায়ভুক্ত। জড় বিষয় ঋত নিয়মানুগ, অন্যদিকে মনুষ্যজগতে সেটি ধর্ম নামে খ্যাত। প্রাক্ বৈদিক যুগ থেকে নৈতিক নিয়মশৃঙ্খলা প্রচলিত এবং কখন ঋত ও কখন ধর্ম বারংবার আলোচিত। ঋত ও ধর্ম কিছুক্ষেত্রে সত্যর সঙ্গেও সমার্থক অর্থে গৃহীত হয়েছে। সত্য অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা। ঋত, ধর্ম ও সত্য সর্বত্র বিরাজমান। "ঋতেন বিশ্বম্ ভূবনম্ বিরাজতঃ।"

'ঋত' অসমাপ্ত নিয়মের ন্যায় পরিব্যপ্ত ধর্ম বা সত্য রূপে। নিয়মের অতিক্রম অসম্ভব। অমান্য করার ফল বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে ফিরে আসে। কর্মবাদ তারই সবিশেষ ব্যাখ্যা দেয়। কার্য ও কারণ যেরূপে আবশ্যিক অনিবার্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মও অবশ্যম্ভাবী কর্মফলের জনক। অহং সর্বস্ব পুরুষ ফলাকাঙ্খা তাড়িত কর্ম সম্পাদন করে এবং কর্মের কর্তারূপে অভিলাষী হয়ে ওঠে। সেই কর্মের ফল ব্যক্তিতেই আরোপিত হয়। কর্মনীতিও ঋত-ধর্ম অনুসৃত, ব্যতিক্রমহীন। ভারতীয় দর্শনে বলা হয়, কর্মফল ভোগ বর্তমান জীবনে সম্পূর্ণ না হলে, সঞ্চিত কর্ম রূপে ভবিষ্যৎ জীবনে প্রতিফলিত হয়। অনারব্ধ কর্ম সংস্কার আকারে আত্মায় সঞ্চিত হয়। আত্মা, বর্তমান দেহ বিনষ্ট হলে আবার নতুন দেহ ধারণ করে ও অতীত জীবনের কর্মফল ভোগ করে। জীবাত্মা, দেহকে আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন মনে করে ইন্দ্রিয় কামনায় নিয়ত হয়। ফলত কর্মফলের আশায় কৃতকর্মের ফল, তাকেই ভোগ করতে হয় — তা থেকে কোনোভাবেই নিষ্কৃতি নেই। তাই ভারতীয় চিন্তাধারায় কর্মবাদের পরিণতি স্বরূপ পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত। এবং এই মতবাদের স্বপক্ষে যুক্তিতে বলা হয়, সৎ স্বজন ব্যক্তি চরম দুঃখ দুর্দশায় জীবনযাপন করেন। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি অনৈতিক কর্মে নিযুক্ত থেকেও সুখে জীবন কাটান। পাশ্চাত্য বিশ্বাস থেকে যদি বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এমন হয় তবে ঈশ্বরের ধারণা ক্ষুণ্ণ হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে তা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আবার যারা ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না তাদের নিকট একটি বিকল্প পরে থাকে। বলতে হয় যে, মানুষ তার নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। সেখানে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র একটি যুক্তি সংযোজিত করে বলেন, বর্তমান জীবনে তিনি স্বজন ব্যাক্তি, কায়-মন-বাক্যে ন্যায়পরায়ণ; তবে বর্তমান জীবনের বিড়ম্বনার উত্তরে অতীত জীবনের কর্মফল ছাড়া আর কোনো বিকল্প অবশিষ্ট থাকেনা। অতএব, কর্মবাদের ব্যাখ্যাও অলঙ্ঘনীয় ঋত নিয়মাধীন।

বৈশেষিক দর্শনে ঋত-কে অদৃষ্ট বলা হয়। কর্মানুসারে ফল প্রদায়ক ধারণা হলো 'অদৃষ্ট'। এক অপ্রত্যক্ষযোগ্য শক্তি। এই বিমূর্ত শক্তির পরিচালক বা নিমিত্ত কারণ স্বরূপ সচেতন কর্তা, ঈশ্বর স্বীকার করা হয়। নিরীশ্বরবাদী দর্শন সম্প্রদায় মীমাংসা দর্শনের 'অপূর্ব' প্রত্যয়টি ঋত নিয়মের সমার্থক। কারণ অপূর্ব; কর্ম ও তা থেকে জাত ফলের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। নিরীশ্বরবাদী ধর্ম অপেক্ষা নীতিধর্মীয় মতবাদ রূপে অধিক পরিচিত বৌদ্ধ দর্শন। এই দর্শন সম্প্রদায় কর্মবাদ প্রসঙ্গে এক নতুন অভিনব তথ্য প্রদান করে। সেখানে বলা হয়, কোনো একজন ব্যক্তির সুকর্মের ফল যেমন কেবলমাত্র ওই ব্যক্তি একা উপভোগ করেন না, ঠিক তেমনি কোনো কুফল সমগ্র সমাজকে ভোগ করতে হয়। বৌদ্ধধর্ম এক্ষেত্রে এক বিশ্বধর্মের ইঙ্গিত বহন করে। মনুষ্য জাতি যে প্রাকৃতিক বিপন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন, Anthropocene যুগের সূচনা ঘটেছে যে কারণে, তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কর্মফল নয়। মানুষের সমষ্টিগত কর্মফল। সমগ্র মানব প্রজাতি দায়ী। কর্ম মাত্রই ফল প্রসব করবেই। বর্তমান প্রজন্মের কর্মফল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভোগ করবে। গীতায় বলা হয়, কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্ম ফল উৎপাদক নয়। অর্থাৎ ফলাকাঙ্খা বর্জিত কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যোগ্যস্থ কর্মের কথা বলেন। ফলের কামনা ত্যাগ করে কর্মের সাথে বুদ্ধি বা বোধ শক্তিকে যুক্ত করে কর্মই যোগ্যস্থ কর্ম। বুদ্ধির অপপ্রয়োগ নয় — যা সুনিশ্চিত করে সর্বজীবের কল্যাণধর্ম। তা না হলে কর্মফল পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে তার দুর্বিষহ প্রভাব নিরন্তন বজায় রাখবে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবে।

মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করেছে। বৃক্ষরাজি কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে বায়ুমণ্ডলকে পরিশোধিত করে। কিন্তু জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ও নিত্য-নতুন শিল্প কারখানার পত্তন, বনাঞ্চলকে ছটো করতে করতে তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। উচ্চফলনশীল বীজ ও মিথেন সারের ব্যবহার কৃষিজমির গুণমান বিনষ্ট করেছে। আবার চাষের জমি থেকে বিষাক্ত সার পৃথিবীর জলাভূমিকে দূষিত করছে। প্রসাধনী দ্রব্য যেমন তাপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র থেকে নির্গত ক্লোরোফ্লুরোকার্বণ বায়ুমণ্ডলের ওপর এক বিস্তীর্ণ স্তর তৈরি করেছে যা বিশ্ব উষ্ণায়ণের মূখ্য কারণ। আগত সূর্য রশ্মি তাপ বিকিরণ করে ওই স্তর ভেদ করে পুনরায় মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারছেনা। দিনের পর দিন পৃথিবী পৃষ্ঠ উতপ্ত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাবে মেরুপ্রদেশে বরফ গলতে শুরু করেছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঊর্ধ্বমুখী। এই সমস্ত কিছুই বলপূর্বক প্রাকৃতিক 'ঋত' নিয়ম শৃঙ্খলায় পরিবর্তনের প্রচেষ্টার ফল, যা আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট।

মানুষ এখন দ্বন্দ্বের মধ্যে, কোন ধর্ম পালনীয় — সাধারণ ধর্ম নাকি বিশেষ ধর্ম! বিশেষ ধর্ম পৃথিবীতে এনে দিয়েছে সুখ-সাচ্ছন্দ্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে উন্নত। জীবনে এসেছে অবসর সময় যা মানুষ নিজস্ব আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করে। আর অবহেলিত হয়েছে সাধারণ ধর্ম। মানুষের উচ্চাভিলাসা তাকে সমাজের অন্যান্য প্রাণী থেকে বিমুখ করেছে। কিন্তু তাদের দায়ভার মানুষেরই কাঁধে। সাময়িক সুখের লোভে সে আঘাত করেছে প্রকৃতি জগতকে, প্রাণী জগতকে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব পারস্পরিক সহযোগিতায়। জগতের প্রতিটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ। কোনোভাবে একটি প্রজাতি বা প্রাকৃতিক শক্তির ক্ষয় অপূরণীয়। যা পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই বৈদিক জ্ঞানতত্ত্বে গৃহীত ঋত বা ধর্ম নিয়ম স্মরণ করার মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণের সময় আজ এসেছে। সমগ্র মানব সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সামিল হতে হবে। তবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্থায়িত্ব পাবে। ঋতধর্মের অনুসরণ পুনরায় জগতে সাম্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। যেহেতু জাগতিক বিষয় সমূহ ঋতধর্ম নিয়মানুগ, তাই মানব জীবনের ন্যায়বিচার ঋত নির্ভর। ঋত পরিনামী জগতের বিচিত্র প্রকাশ। সৎ ব্যক্তির বিশেষ গুণধর্ম ঋত অনুসরণ। ঋত অমান্যকারী ব্যক্তি অনৈতিক বলে পরিগণিত হয়। মানুষ সামজিক ধর্ম লঙ্ঘন করেছে বলেই বিনাশী যুগ Anthropocene বা মনুষ্যযুগ নামে খ্যাত। ঋত নীতিই পারে মনুষ্যযুগের অগ্রসরতা প্রতিহত করে মানুষকে পুনরায় জীবনমুখী করে তুলবে।

তথ্যসূত্র:

১. "VEDIC CONCEPT OF RIT." Bhupendra Chandra Das,. Journal of East-West Thought (n.d.).

২. “RIt" and "DHARMA" The ancient indian concept of law and justice." krishna Das, (Dec 1,2022).

৩. A HISTORY OF INDIAN PHILOSOPHY,SURENDRANATH DASGUPTA, CAMBRIDGE AT UNIVERSITY PRESS, n.d. 1922 pp. 71-75

৪. ‘নীতিবিদ্যা ও মনোবিদ্যা’, দীক্ষিত গুপ্ত, ওয়েব ইম্প্রেশন, ২০০৬.

৫. ‘প্রাচীন ভারতে পরিবেশ ভাবনা’, রাজকুমার পণ্ডিত, অনুরণন (n.d.)

৬. ‘ফলিত নীতিশাস্ত্র’, ডঃ সন্তোষকুমার পাল, n.d. পৃ. ১৫০-১৬৫, ১৯৯-২০২

৭. ‘সাম্মানিক নীতিবিদ্যা ও ধর্মদর্শন’, ডঃ সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, n.d. পৃ. ২৯১

৮. ‘সাংখ্যকারিকা’, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু শর্ম্মা, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯০১, বাংলা পৃ. ৭৫

৯. ‘অ্যানথ্রোপোসিন: পৃথিবীতে মানবসৃষ্ট বিপরযয়কে পুঁজি করে নতুন যুগের সূচনা’, সূত্র: ইন্ডিপেনডেন্ট, দ্য গার্ডিয়ান, আন্তর্জাতিক, ৩০ আগস্ট, ২০১৬ ।

লেখক পরিচিতি: শুক্লা নাথ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার ১, দর্শন বিভাগ, আশুতোষ কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ।